ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সকলের–
মহাবিপর্যয় রোধে সেক্যুলার ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই[১]

ড. আবুল বারকাত

সাম্প্রদায়িক জঙ্গীবাদ– সংকট না'কি ঐতিহাসিক-জাতীয় বিপর্যয়? বিপর্যয়ের প্রকৃতি ও গভীরতা

মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের প্রতিশোধস্পৃহা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এখন তারা ধর্মের নামে নির্বিচারে মানুষ খুন করছে। উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী এ জঙ্গীরা ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতাটিকেই এখন দখল করতে চায়। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চলেছে। ওদের জঙ্গীত্ব ক্রমান্বয়ে অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করছে– প্রথমে নিরীহ বেশে ধর্মের বাণী, তারপরে শরীর চর্চার নামে একটু-আধটু প্রশিক্ষণ, তারপরে পটকার খেলা, তারপরে স্পিলিন্টার ছাড়া বোমা, তারপর পিস্তুল-রিভলভারের খেলা-প্রদর্শন, তারপর সভাস্থলসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি হত্যার প্রয়াস, তারপর বাঙ্গালী জাতিকে রাজনীতিবিদ শূন্য করার প্রচেষ্টা, তারপর এক সাথে একই সময়ে দেশের সব জেলা শহরের সরকারি অফিস ও বিচারালয়ে বোমা, তারপর বিচারক হত্যা, আর সবশেষে সুইসাইড বোমা। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের ক্রমধারা যা তাতে স্পষ্ট যে ওরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং সুইসাইড বোমাই শেষ কথা নয়। সামনে সম্ভবত আরো বড় মাপের নূতন ধরনের বিপর্যয় ঘটবে (যদি নিরস্ত্র না করা যায়) যা হয়তো বা এ মুহূর্তে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। বাঙালী জাতির ইতিহাসে এ কোনো সাধারণ সংকট নয়– প্রকৃত অর্থেই মহা-বিপর্যয়; গভীর সংকটের এ এক ক্রান্তিকাল।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জনকল্যাণমুখী রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির অভাবে এমনিতেই দেশের অর্থনীতি দুর্বল আর এখন যত্রতত্র এবং মোটামুটি প্রাত্যহিক জঙ্গীত্ব দুর্বল এ অর্থনীতিকে দুর্বলতর করছে। ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন মানের (যা এমনিই বেশ ভঙ্গুর) দ্রুত অধোগতি ঘটছে, আর অন্য দিকে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষই প্রত্যেকের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তিত। এ অবস্থায় আর যাই হোক সুশৃংখল কোনো অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কারো উৎসাহ-প্রেরণা থাকার কথা নয়। অন্ধকার এক স্থবিরতার দিকে এগুচ্ছে দেশ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজ এখন প্রকৃত অর্থেই এক মহাবিপন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুবৃর্ত্তায়নের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীবাদ। এ জঙ্গীবাদ অতীতে তাদের জঙ্গীত্ব প্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। আর এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট কৌশলিক; প্রায় প্রতিদিনই তারা তাদের সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করছে এবং প্রতিদিনই তারা নিরীহ মানুষ হত্যা করছে; তাদের বোমায় ইতোমধ্যে বহু নিরীহ মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ প্রক্রিয়ায় আত্মঘাতি বোমারু হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার মানুষ এবং প্রায় সকলেই আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষালয় থেকে এসেছেন এবং প্রায় সকলেই একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের অনুসারী। সে সাথে গবেষণায় দেখা যায় যে এসব জঙ্গীরা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে এক শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে যা দেশজ ও বিদেশি উভয় উৎসের সাথে সম্পর্কিত।

---

[১] সেক্যুলার ইউনিটি বাংলাদেশ আয়োজিত *"ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সকলের–সংকট উত্তরণে সেক্যুলার ঐক্যের কোনো বিকল্প নাই"* শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থাপিত, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা: ৩১ ডিসেম্বর ২০০৫/১৭ পৌষ ১৪১২

উগ্র সশস্ত্র জঙ্গীবাদ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এতই সংগঠিত ও শক্তিমান যে জঙ্গী ধরা পড়লে ক্ষমতার ভিতরেই কোনো কোনো শক্তি তাদের ছেড়ে দেবার জন্য প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগ করছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছেন; চিহ্নিত জঙ্গীদের ধরে ছেড়ে দিতে হচ্ছে; আর তাদের মুখ্য নিয়ন্ত্রক গড-ফাদার'রা সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। সরকারের অন্দর মহলের সদিচ্ছা নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যখন "সবই মিডিয়ার সৃষ্টি" বলে জঙ্গীবাদকে তুচ্ছ করা হয়; যখন বলা হয় জঙ্গীবাদীদের সাথে সরকারের অন্দর মহলের কোনোই সম্পর্ক নেই অথচ অন্দর মহলের কেউ কেউ আবার সুনির্দিষ্টভাবে এ সম্পর্কের কথা বলছেন; যখন জঙ্গীবাদী বলে কোন বেসরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করে আবার তারই নামে ২ কোটি টাকার বাহক-চেক পাশ করা হয়; যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের ভিতরেই দ্বিধাবিভক্তি স্পষ্ট; যখন জাতীয় মসজিদের মূল ইমাম সাহেব একই সাথে বলেন যে ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ-ওরা বিপথগামী তবে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম হলে সব ঠিক হয়ে যাবে; যখন বলা হয় ওদের গতি আমাদের চেয়ে বেশি; যখন বলা হয় আসছে দু'মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে আর একই সাথে বলা হচ্ছে এটা গ্লোবাল সমস্যা (অর্থাৎ আমাদের করার কিছু নেই) ইত্যাদি। এ অবস্থাকে দেশের মানুষের স্বাভাবিক জীবন-নিরাপত্তা ও সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এখন প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে গণ্য করা চলে।

মহা-সংকটটি এমনি যে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মান্ধ রাজনীতিকরা অনেক গুরুতর ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা এখন প্রকাশ্যেই বলছেন। যেমন তারা বলছেন:

১. "১৯৭১ আর ২০০৫ সাল এক কথা নয়"।
২. "আমরা কচুপাতার ওপর বৃষ্টির পানি নই যে টোকা দিলে পড়ে যাবো"।
৩. "কোথায় আজ ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, আর আমরা আজ কোথায়" (?)
৪. "সংসদের কয়েকটি আসন দিয়ে আমাদের শক্তির বিচার করলে ভুল করবেন"।
৫. "শীঘ্রই ইসলামী শাসন কায়েম হবে। দেখুন-অপেক্ষা করুন; পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকুন"।
৬. "ইসলামে আত্মহত্যা পাপ তবে ইসলামী শাসন/হুকুমত কায়েম হয়ে গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"।
৭. "জ্ঞানপাপী মানুষ প্রণীত সংবিধানের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করতে সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে দেশে যতদিন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হয় ততদিন তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন"।
৮. "সশস্ত্র জেহাদ করা আমার অধিকার, আর ঐ জেহাদে অংশগ্রহণ আমার দায়িত্ব। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনে বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই"।

ইসলামী জঙ্গীত্ব-উদ্ভূত মহাসংকটের গভীরতা এখানেও যে ইতোমধ্যে ধৃত জঙ্গীদের প্রায় সবাই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, প্রায় সবাই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে এসেছেন, প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সদস্য (ছিলেন অথবা আছেন)। আরো দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে এখন পর্যন্ত ধৃত ১৫০০ জঙ্গীদের গড় বয়স মাত্র ২২ বছর (১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে)। অথচ ১০-১৫ বছর আগে গণমাধ্যমে জঙ্গী প্রশিক্ষণের যেসব সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছিল অথবা ১০-১৫ বছর আগে যারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বার্মাতে জঙ্গী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের গড় বয়স তো এখন হবে ৪০ বছর– তারা কোথায়? আর যারা ১৯৭১-এ আল বদর-আল শামস-রাজাকার-শান্তি কমিটির নামে

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন এবং/অথবা মুখ্য পরামর্শদাতার কাজ করেছিলেন তাদের বয়স তো এখন ৫৫-৮০ বছরের মধ্যে– তারা কোথায়? অর্থাৎ সম্ভবত গডফাদারদের আড়াল করার জন্যেই দেশি-বিদেশি চাপে পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন লোক দেখানো ফ্রন্ট-লাইনের দু'একজন ধরে ধরে দেখানো হচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করারও এ এক নবতর কৌশল হতে পারে। মহাবিপর্যয়টি এখানেও। আসলে শর্ষের মধ্যেই ভূত। আর ভূতের জন্মবৃত্তান্ত না জানলে ভূত তাড়ানো অসম্ভব।

শান্তির ধর্মের রাজনীতিকরণ– কিভাবে ঘটলো?

এখন প্রায়ই শুনি যে 'সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব-সংশ্লিষ্ট জাতীয় বিপর্যয়টি সৃষ্টি হয়েছে ২০০৫ এর ১৭ আগস্ট'-এ। এ বিশ্লেষণে আমার অসুবিধা আছে। কারণ এ দিনটিকে মহাবিপর্যয়ের বহিঃপ্রকাশের অনেক দিনের এক দিন বলা যেতে পারে। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব-উদ্ভূত মহাবিপর্যয় বহিপ্রকাশের অন্যান্য দিন-তারিখও আছে– যেমন ৬ মার্চ ১৯৯৯ (উদীচী, যশোর), ১৪ এপ্রিল ২০০১ (পয়লা বৈশাখ, ঢাকা), ৭ ডিসেম্বর ২০০২ (সিনেমা হল, ময়মনসিংহ), ২১ মে ২০০৪ (শাহজালাল দরগা, সিলেট), ২১ আগস্ট ২০০৪ (শেখ হাসিনার সভা, ঢাকা) ইত্যাদি। আর ১৯৭১-এর ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী নিধন এবং ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের পরিবার-পরিজনসহ হত্যা কি আজকের সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের সাথে সম্পর্কহীন কোনো বিষয়? সুতরাং, মহাবিপর্যয় এক দিনে সৃষ্টি হয়নি এবং তা অপরিকল্পিতও নয়। বিপর্যয়ের ক্ষেত্র (space) সৃষ্টি হয়েছে একটু একটু করে আর সেই সাথে এক সময়ের উদারনৈতিক-মানবতাবাদী ইসলাম রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক ইসলামে। আজকের জঙ্গীবাদী মহাবিপর্যয়ের কার্যকরণ যোগসূত্র বুঝতে হলে এ প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

নির্মোহ ইতিহাসটি এ রকম– এদেশে ইসলাম ধর্মের মূল প্রচারকেরা অর্থাৎ সুফি-সাধক-ওলামারা শত শত বছর ধরে কোনো উগ্র ধর্মীয় আচার প্রচার করেননি; এমনকি তাঁরা তা সমর্থনও করেননি। উল্টো তারা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রচারের স্থান যেমন মাজার, মসজিদ, মাদ্রাসাকে রেখেছিলেন আয়তনে ছোট, আর বড় করেছিলেন পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি কাজের এলাকা। অর্থাৎ তারা মানুষকে সম্পৃক্ত করেছিলেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে-মূলত: কৃষি কাজে। সেই সাথে সুফিরা যত না অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে। "আশরাফুল মাখলুকাতের সেবাই ধর্ম"– এ তাদেরই কথা। সুফিরা কখনও কোথাও অন্য ধর্মের উপাসনালয় ভেঙ্গেছেন– এ দেশের ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই। আসলে সুফি-ওলামারা ইসলাম ধর্মের মতাদর্শের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কৃষি কাজের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশে তরবারি অথবা অভিবাসন অথবা পৃষ্ঠপোষকতার তেমন কোনো ভূমিকা নেই; এখানে ইসলাম বিকশিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে। ইসলাম ধর্মের সুফি সাধকসহ অন্যান্য অনেক ধর্ম প্রচারক এ দেশে সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধী লড়াই-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন; এমনকি নেতৃত্বও দিয়েছেন। সুফি-ওলামারা ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক যুক্তি ব্যবহার করেই তা করেছেন। শুধু তাই নয় বাংলায় মুসলিম শাসনের সাথে ইসলামীকরণের অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই[২]। সুতরাং উদ্ভব সূত্রে এ দেশে ইসলাম মানবতাবাদী, উদারনৈতিক ও সেক্যুলার[৩]। অর্থাৎ এ দেশের মুসলমানেরা ঐতিহাসিকভাবেই এক পজিটিভ ডিএনএ-র বাহক। আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের এ পজিটিভ ডিএনএ-র ঐতিহাসিক উপস্থিতির কারণেই সশস্ত্র জঙ্গীত্ব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না।

---

[২] বিস্তারিত দেখুনঃ Abul Barkat (2005), "Economics of Fundamentalism in Bangladesh: Roots, Strengths, and Limits to Growth", presented at Cornell University, USA, 15 October 2005.

[৩] 'সেক্যুলারইজম' ১৯৭২-এর সংবিধানের চার ভিত্তির অন্যতম ভিত্তি। প্রত্যয়টির প্রচলিত বঙ্গানুবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা। যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষতাকে কেউ কেউ ধর্মহীনতার সাথে সমার্থক করে থাকেন সেহেতু মর্মার্থ বিকৃতি দূর করতে ইংরেজি সেক্যুলারইজম/সেক্যুলার প্রত্যয়দ্বয় ব্যবহার করেছি।

ঐতিহাসিক উদ্ভব সূত্রে যে ইসলাম মানবতাবাদী তা কেনো, কিভাবে রাজনৈতিক ইসলামে রূপান্তরিত হ'লো? ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব কিভাবে এলো? এর পিছনে আমি প্রধানত ছয়টি কারণ খুঁজে পাই। প্রথমত: ইসলাম ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র– পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭); দ্বিতীয়ত: ১৯৭১-এ স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রদানে ব্যর্থতা; তৃতীয়ত: ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তৃতির পথ প্রশস্ত করা; চতুর্থত: ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি সেক্যুলারইজম বর্জন করে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে ধর্মকে রাষ্ট্রের অংগে রূপান্তর এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি স্বীকৃতি দেয়া (আসলে বাংলাদেশ হয়ে গেলো বাংলাস্তান); পঞ্চমত: স্বাধীনতা উত্তর কালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন পরিপুষ্ট করা; এবং ষষ্ঠত: অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে দেশে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-বঞ্চনা সৃষ্টির সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা; এ বৈষম্য-বঞ্চনা একদিকে যেমন অন্য পাঁচ কারণ থেকে উদ্ভূত আর অন্যদিকে এ বৈষম্য-বঞ্চনা নিজেই জঙ্গীত্ব পুনরুৎপাদনে প্রয়োজনীয় শর্ত (necessary precondition) হিসেবে কাজ করে।

পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে প্রথম বড় মাপের পশ্চাদমুখী বিপর্যয় ঘটেছে গত শতাব্দিতে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এলো– অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আর হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভিত্তিক দেশ বিভাজনে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক ধারার বিপরীতে পশ্চাদমুখী এ রূপান্তর হঠাৎ ঘটেনি– এর পিছনে একসাথে কাজ করছে জঙ্গিবাদী সুনির্দিষ্ট ধারা (যেমন ওহাবি ইত্যাদি), দু'শতাব্দির ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, এবং হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার। ফলে ইসলাম ধর্মের মানবকল্যাণকামী সুফি-ওলামা চেতনার এক ঋণাত্মক উত্তরণ ঘটলো– যা ছিলো উদারনৈতিক-মানবতাবাদী তা রূপান্তরিত হলো সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতায়, উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। অর্থাৎ ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশে এক পশ্চাদমুখী প্রবণতা সৃষ্টি হল। আর তা হলো কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা থেকে সশস্ত্র মৌলবাদী ধারণাপুষ্ট রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রবণতা। পাকিস্তানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এ ধারা এতই প্রবল হলো যে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দুদের হিন্দুস্থানী বানাতে তৎকালীন ধর্ম ব্যবসায়ী সামন্ত-সেনা শাসকদের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগেনি– জারি করলেন "শত্রু সম্পত্তি আইন" যেখানে হিন্দু মাত্রেই শত্রু। রাষ্ট্র-পরিতোষিত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার এমন নমুনা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময়টা (১৯৪৭-৭১) রাষ্ট্র পরিচালন এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যে কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে– কিছু হলেই বলা হয়েছে "ইসলাম বিপন্ন"। মিলিটারি শাসন ও স্বৈরাচার বলবৎ রাখতে "ইসলামের বিপন্নতা" ছিল একমাত্র স্লোগান। সবশেষে এটাই ব্যবহার করা হয়েছে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে– "ইসলামের বিপন্নতা" ব্যবহৃত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন পাঞ্জাবী-সিন্ধি-বেলুচ সৈন্য আনা হয়েছে তখন। একই স্লোগান ব্যবহৃত হয়েছে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী গুটি কয়েক বাঙ্গালী মুসলমান নিয়ে শান্তি কমিটি, আল বদর, আল শামস, রাজাকার ইত্যাদি বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায়। এসব যুদ্ধাপরাধীরা নিশ্চিত ছিল যে মুক্তি-স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীরা পরাক্রমশালী পাক সেনাবাহিনী ও রাজাকার-আলবদরদের কাছে পরাজিত হবে। উল্টোটা ঘটেছে। অনেক রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তবে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধি যুদ্ধাপরাধী জাতীয় শত্রুদের কোনো ধরণের শাস্তির বিধান আমরা কার্যকর করতে পারিনি। এটাও পরবর্তীকালে তাদের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। জাতির পিতার নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পাকিস্তানে জঙ্গী প্রশিক্ষণ, আফগানিস্তানে তালেবান প্রশিক্ষণ, বার্মায় জঙ্গী প্রশিক্ষণ, দেশের ভিতরে জঙ্গীত্ব বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড– এ সব তারাই সংগঠিত করেছে; এসবের একই উৎস, একই লক্ষ্য। ধর্ম ব্যবসায়ী সংগঠিত এ গোষ্ঠি এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কিছু অনুসারীরাই বাংলাদেশে

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীবাদী রাজনীতির চালক। এদেশে ধর্মের ইতিহাসে এ এক চরম বিকৃতিকাল– বলা যায় পশ্চাদমুখী রূপান্তরের দ্বিতীয় কালপর্ব। এ দেশে ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক মূল ধারার বিকাশের সাথে বর্তমান মৌলবাদী রাজনীতি-অর্থনীতির বিপরীতধর্মী পার্থক্যটা এখন স্পষ্ট।

পাকিস্তান রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িকতা শুধু রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি হিসেবেই কাজ করেনি তা শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই অর্থনীতির বৈষম্যে পিষ্ট মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল। এ দেশের মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন জনকল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্রের– যে রাষ্ট্রে নিশ্চিত হবে চয়নের স্বাধীনতা: অবারিত হবে অর্থনৈতিক সুযোগ, উন্মেষিত হবে সামাজিক সুবিধাদি, পাওয়া যাবে রাজনৈতিক মুক্তি, থাকবে স্বচ্ছতা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা, পাওয়া যাবে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ, প্রস্ফুটিত হবে ধর্ম নিরপেক্ষ আচরণ। আর আশা ছিল যে এসব কিছুই ঘটবে মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে সেক্যুলার মানস-কাঠামো ও জীবন আচরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায়। এই ছিল আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকারের মর্মবস্তু যেখানে সুস্পষ্ট বলা "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক"। এ লক্ষ্যে সংবিধান মৌলিক চাহিদা মেটানো থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমানাধিকারের অঙ্গীকার করে প্রকাশ্যে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এ অঙ্গীকারের সাথে বাস্তবের ফারাক ক্রমাগতভাবে এতই বেড়েছে যখন মৌলবাদের অর্থনীতি ও জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক জঙ্গী রাজনীতির বিস্তৃতি অবশ্যই সম্ভব।

মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীত্ব বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি

দুই অর্থনীতির বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে এ কথা সত্য। তবে গত তিন দশকের বিকাশের ধারা ১৪ কোটি মানুষের আমাদের দেশকে সুস্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভাজিত করেছে। জনকল্যাণ-বিমুখ রাজনীতি-অর্থনীতির মারপ্যাচে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক অবস্থা যেখানে ১০ লাখ ক্ষমতাধর-দুর্বৃত্তের বিপরীতে আছেন ১৩ কোটি ৯০ লাখ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত মানুষ। প্রকৃত অর্থে এই বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোনোও প্রয়াস নিরবচ্ছিন্নভাবে কখনও (অন্তত: গত তিন দশকে) বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো, লুটেরা ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা বৃদ্ধির বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এ সমীকরণ ব্যাপক জনগোষ্ঠির মধ্যে ক্রোধ-দ্রোহ সৃষ্টি করবে তা অস্বাভাবিক নয়। আর ক্রমবর্ধমান বৈষম্য সৃষ্টিকারী ভারসাম্যহীন এ বিকাশ সমীকরণে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাস বিকৃতির শিকার ২১ বছর বয়সী দরিদ্র ঘরের কোনো সন্তান যদি "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে 'বেহেশতবাসী' হবার জন্য আত্মাহুতি দেন তা অযৌক্তিক হবে কেনো? এক্ষেত্রে পরকালে বেহেশত আর ইহকালে প্রাপ্তি যোগ থাকলে তো কথাই নেই।

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির হিস্যা উত্তরোত্তর কমছে, আর ধনীদের বাড়ছে– একথা সরকারিভাবেই স্বীকৃত। এ দেশে গত তিন দশকে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ বেড়েছে; নগরায়নের নামে হয়েছে আসলে বস্তিয়ায়ন– গ্রামের মানুষ ভূমিহীন হয়ে নিঃস্ব অবস্থায় অনন্যোপায় দেখে শহরে এসেছে, যেখানে অনানুষ্ঠানিক খাতের বাইরে তেমন কিছু নেই। এ দেশে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিচালক সরকারেরা কখনও বোঝার চেষ্টা করেননি– মানুষ কেন গরীব হয়; এসব মানুষকে তারা সবসময়ই গরু-ছাগল তুল্য মনে করেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে গত ২০ বছরে এ দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে; আর সেই সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় যে দরিদ্ররা দরিদ্রতর হচ্ছেন; নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ রূপান্তরিত হচ্ছেন দরিদ্রে; মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন; উচ্চ মধ্যবিত্ত নিজের অবস্থান রক্ষায় জীবনপাত করছেন; ধনীরা হেন দুর্নীতি নেই যা করছেন না। এ

সবই ঘটছে অর্থনীতি, রাজনীতি, আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতির মধ্যে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন ইত্যাদি। এসবই কিন্তু ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মৌলবাদের অর্থনীতির গঠন ও বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান।

মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির উদ্ভব ও বিস্তৃতি সহায়ক গত তিন দশকের বিকাশ প্রবণতা যে চিত্র দেখায়, তাতে স্পষ্ট যে, যা কিছু মানবকল্যাণবিমুখ ও উন্নয়ন বিরোধি সেগুলো উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে; মনুষ্য সম্পর্কসহ সবকিছুই বাজারি পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে; প্রান্তস্থ আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের অভাবে উৎপাদনশীল ও জনকল্যাণমুখী ভিত্তি সম্প্রসারিত হতে পারেনি। উন্নয়নের ব্যালান্স-শিট বলে যে, যা বৃদ্ধি পেলে সকলের জন্যই মঙ্গল হতো, তা বৃদ্ধি পায়নি, হ্রাস পেয়েছে, আর যা হ্রাস পেলে ভাল হত, তা দ্রুতহারে বেড়েছে: গত তিন দশকে কিছু মানুষ অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছেন আর ব্যাপক জনগোষ্ঠী নিঃস্ব হয়েছেন– আর নিঃস্ব মানুষ আশ্রয় খোঁজেন, নিঃস্ব মানুষ নিরাশ-হতাশ, আর হতাশ মানুষ ধর্মে মুক্তি খোঁজেন। গত তিন দশকে সম্পদের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ তেমন হয়নি, অনুপার্জিত আয় অধিক হারে অনুপার্জিত আয়ের উৎস খুঁজেছে; কিছু মানুষের জৌলুস বেড়েছে আর ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা-দুর্দশা সম্প্রসারিত হয়েছে; উঠেছে বহুতল ভবন, বেড়েছে বস্তি। সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ জনকল্যাণে কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে; বেড়েছে বৈদেশিক খবরদারি, কমেছে দেশজ স্থানীয় উদ্যোগ; বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে সরকারি ব্যয়-বরাদ্দ, সেই সঙ্গে বেড়েছে পাবলিকের সঙ্গে পাবলিক সার্ভেন্টদের দূরত্ব; বেড়েছে নির্বাচনে কালো টাকার প্রতিযোগিতা, কমেছে সুশাসন আর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা; আর এ সবেরই ফলে সমান তালে বেড়েছে কালো টাকার দাপট, কমেছে জনগণের প্রতি রাজনীতিবিদদের মমত্ববোধ। বেড়েছে শিক্ষায় ধনী-দরিদ্র বৈষম্য, কমেছে মৌলিক শিক্ষাখাতে সরকারি প্রকৃত ব্যয় বরাদ্দ; বেড়েছে দারিদ্র-উদ্ভুত অসুখ-বিসুখ এবং চিকিৎসা ব্যয় উদ্ভুত নি:স্বায়ন, কমেছে সরকারি স্বাস্থ্য খাতের কার্যকারিতা। আর এসবের ফলেই একদিকে সমানতালে বেড়েছে ধর্ম-ব্যবসা, পীর-ফকিরের সংখ্যা, জ্যোতিষির সংখ্যা, ভাগ্যবিশ্বাস, ধর্মের নামে সহিংসতা, আর অন্যদিকে কমেছে ভিন্ন ধর্মের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, বিজ্ঞান চর্চা, সেক্যুলার আচরণ ও মানস কাঠামো– এক কথায় সুপ্রশস্ত হয়েছে সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকীকরণের ভিত্তি। এসবের পাশাপাশি শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ ধর্মীয় মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্র/ছাত্রীর মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩০০০ টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫০০০ টাকা। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। আর ইতোমধ্যে ধৃত উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিদের অধিকাংশই কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবারের সন্তান। এসব সহসম্পর্ক বিবেচনায় না রাখলে মহাবিপর্যয় অনিবার্য।

সুতরাং বিশ্লেষণে এ উপসংহারে উপনীত হওয়া সম্ভব যে যদিও কয়েক শতাব্দির ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতি ও রাজনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত অর্ধশতাব্দির মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা আর সেই সাথে রাজনীতি-প্রশাসনে সাম্প্রদায়িক শক্তির অপেক্ষাকৃত দৃঢ় অবস্থান ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে। আর পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের তেল-গ্যাস ক্ষুধা (বুশ-সাহেব কেন ইরাক দখল করলেন– এ দেশের সাধারণ কোনো মানুষ প্রশ্নটি করলে তার সদুত্তর সহজ হবে কি?), অস্ত্র ব্যবসার বিভিন্ন সমীকরণ ও অসম বিশ্বায়নসহ তথাকথিত উন্নয়নের অনেক উপাদানই এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীবাদী রাজনীতির বিস্তৃতি ও প্রবণতা

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্ক্ষিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহি সংসদ। দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নে যা ঘটেছে তা হলো গত তিন দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে ২ লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫% লুট করেছে দুর্বৃত্তরা– যাদের সংখ্যা আসলে ২ লাখ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লাখ মানুষ; এরা এখন বছরে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে, এরাই বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ স্থানান্তরের/পাচারের সাথে সম্পৃক্ত, এরাই বছরে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত, এরাই প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি, এরাই সবধরণের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি ১০ লাখ বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যাক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোনো সরকারি ক্রয়ে অথবা বড় ধরনের বিনিয়োগে এদেরকে কমপক্ষে ২০% কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। আর অর্থনীতির এসব দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করে আছে যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যাক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও তার বড় অংশ আত্মসাৎ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু– জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেন না; জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন– তারা জানেন স্থানভেদে ১ কোটি টাকা থেকে ২৮ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদের একটি আসন ক্রয়/দখল সম্ভব এবং সেটা তারা প্রাকটিশ করেন। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের আত্মার গভীরে অনাস্থা আছে; পাশাপাশি মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই। এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের পশ্চাৎপদ আদর্শ ও সংগঠন বিস্তৃতির অন্যতম সহায়ক উপাদান।

প্রধানত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন/হারিয়েছেন, আর এ শূন্যস্থান পূরণে প্রগতির ধারা বিকশিত হয়নি/হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, অথচ এ কৃষি ভিত্তির উপরই এদেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি। আর তারা স্পষ্ট জানে যে ধর্মীয় উম্মাদনাভিত্তিক দলীয় রাজনীতিকে সাসটেইন করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত প্রয়োজন। সে কারণেই ক্যাডারভিত্তিক দল গঠন ও পরিচালন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মডেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। বলা যেতে পারে এ এক পরীক্ষামূলক অপারেশনস রিসার্চ।

বাংলাদেশে এখন ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় ধর্মীয় মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তার মধ্যে ১২-টি বৃহৎ বর্গ হল নিম্নরূপ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাভাই-জেএমবিসহ অনুরূপ প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম, এবং কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয়– এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেই সাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন। যেমন বাংলাভাই

প্রকল্প যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়।

মৌলবাদের অর্থনীতির এসব মডেলের ব্যবস্থাপনা-পরিচালন কৌশল সাধারণ ব্যবসায়ের নীতি-কৌশল থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন । তাদের অর্থনৈতিক মডেল পরিচালন কৌশলের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: (১) প্রতিটি মডেলই রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ উচ্চমানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত; (২) প্রতিটি মডেলে বহুস্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেখানে নির্দিষ্ট স্তরের মূল নীতি-নির্ধারণী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ; (৩) বিভিন্ন মডেলের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন থাকলেও উচ্চস্তরের কো-অর্ডিনেটরদের পরস্পর পরিচিতি যথেষ্ট গোপন রাখা হয়– এ এক ধরনের গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি; (৪) প্রতিটি মডেলই সামরিক শৃংখলার আদলে ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান; (৫) যে কোনো মডেল যখনই আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অধিক ফলপ্রদ মনে করা হয় তা যথাসাধ্য দ্রুত অন্যস্থানে বাস্ত বায়িত করা হয়। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে “রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে” রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বোমা বিজ্ঞান-তথ্যপ্রযুক্তি বিজ্ঞানসহ মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানকে তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট।

অনেকেই মনে করেন এ দেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীরা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে সমুদয় অর্থ বিদেশ থেকেই পেয়ে থাকে। এ ধারণা বহুলাংশে মিথ্যে হতে পারে যদিও সম-মতাদর্শী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে তাদের যৌথ উদ্যোগের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। আর সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদানের বড় অংশ বিদেশ থেকেই আসে। “জঙ্গীদের সব অর্থই বিদেশ থেকে আসে” এ কথা বলার অর্থ এমনও হতে পারে যে আসলে আমরা তাদের প্রকৃত শক্তি অবমূল্যায়ন করছি। “জঙ্গীদের সব অর্থই বিদেশ থেকে আসে”– এ ধারণা বহুলাংশে সত্য নয় এজন্য যে এ দেশে মৌলবাদ ইতোমধ্যে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে তা হল এরকম– উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বাহক শক্তিটি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে ৭০-৮০-র দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে; এসব অর্থ সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনে বিনিয়োগ করেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করছে; আর এ মুনাফার একাংশ তারা ব্যয় করছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে, একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর একাংশ নূতন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে মুনাফার ব্যয়ের মধ্যে আছে রাজনৈতিক কর্মীদের বেতন ভাতা, দৈনন্দিন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনে ব্যয়, জনসভা আয়োজনে ব্যয়, অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা এবং জঙ্গী কর্মকাণ্ড সংগঠন। জঙ্গী কর্মকাণ্ড নিয়ে সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে যে এ দেশে মৌলবাদীদের ১৪৮-টি অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এসব অভিযোগ বর্তমান সরকার এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে খণ্ডন করেনি।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির এখন বার্ষিক নীট মুনাফা আনুমানিক ১২০০ কোটি টাকা। এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭% আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে যার মধ্যে আছে ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি; দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০.৮% আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৮%; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪%; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২%; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৩%, যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫%; আর সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৫.৮% (সারণি ৩৭ দ্রষ্টব্য)। নীট মুনাফার এ প্যাটার্ন বেশ অনুমান নির্ভর হলেও যথেষ্ট দিক নির্দেশনামূলক– অর্থাৎ খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি মৌলবাদের অর্থনীতির বিকাশ ধারা নির্দেশে যথেষ্ট সহায়ক। সেই সাথে মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানওয়ারি নীট মুনাফার যে কাঠামো দেখা যায় তা মূল স্রোতের অর্থনীতির সাথে যথেষ্ট সাযুজ্যপূর্ণ।

সারণি ৩৭: মৌলবাদের অর্থনীতির খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আনুমানিক বার্ষিক নীট মুনাফা

	অর্থনৈতিক খাত-প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক নীট মুনাফা (কোটি টাকায়)	মোট নীট মুনাফার শতাংশ
০১.	আর্থিক প্রতিষ্ঠান: ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোং ইত্যাদি	৩২৫	২৭.০
০২.	বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান: খুচরা, পাইকারী, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদি	১৩০	১০.৮
০৩.	ঔষধ শিল্প, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান	১২৫	১০.৪
০৪.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোচিং সেন্টার	১১০	৯.২
০৫.	যোগাযোগ: ট্রাক, বাস, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ, কার, তিন চাকার সিএনজি ইত্যাদি	৯০	৭.৫
০৬.	জমি, দালান (রিয়েল এস্টেট)	১০০	৮.৩
০৭.	সংবাদ মাধ্যম, তথ্য প্রযুক্তি	৭০	৫.৮
০৮.	বেসরকারি সংস্থা	২৫০	২০.৮
	মোট	১২০০	১০০

বাংলাদেশে মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণে আছে আনুমানিক ৪৫০টি বেসরকারি সংস্থা। এসব সংস্থা-প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ– বিভিন্নভাবে জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। অনেকগুলোই সরাসরি জঙ্গী সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। এদের কর্মকাণ্ড পরিচালনের আর্থিক উৎস দেশ ও বিদেশ উভয়ই। অভ্যন্তরীণ উৎস হল উল্লেখিত আর্থিক খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কর্মকাণ্ড উদ্ভূত নীট মুনাফা। আর বিদেশি উৎসের অর্থ অনেক ক্ষেত্রেই তারা সরাসরি পেয়ে থাকেন, যার হিসেব পত্তর সরকারি নথি পত্রে অনুপস্থিত। এসব লেনদেনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইদানিং এমনও দেখা গেছে যে জঙ্গীবাদী সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে জড়িত বলে কোনো বেসরকারি সংস্থাকে চিহ্নিত করার পরেও ঐ সংস্থার নামে ২ কোটি টাকার বাহক-চেক পাশ করা হয়েছে। মৌলবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারি সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য জনগণের কাছে পৌঁছানোর জন্য সংস্থার প্লাটফর্মকে ব্যবহার করা এবং পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডার সাথে অর্থনৈতিক স্বার্থের সম্মিলন ঘটানো। এদেশে মূল ধারায় বেসরকারি সংস্থারা যখন নারীর ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন মৌলবাদী বেসরকারি সংস্থারাও পিছিয়ে নেই, তবে তারা বলছেন "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে পর্দার অন্তরালে", "নারীর ক্ষমতায়ন হতে হবে স্বামীর পায়ের নিচে– কারণ ওখানেই বেহেশত"। কৌশলগতভাবেই নারীরা বিশেষত: দরিদ্র নারীরা মৌলবাদী বেসরকারি সংস্থাদের অন্যতম প্রধান টার্গেট।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি যদি বছরে ১২০০ কোটি টাকা নীট মুনাফা সৃষ্টি করে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ মাত্রা যা মৌলবাদের অর্থনীতির শক্তি-মাত্রা নির্দেশ করে– হবে নিম্নরূপ: (১)দেশের মোট বার্ষিক জাতীয় বিনিয়োগের (চলতি মূল্যে) ১.৫৩% এর সমপরিমাণ, (২) দেশের মোট বার্ষিক বেসরকারি বিনিয়োগের ২.১% এর সমপরিমাণ, (৩) সরকারের মোট বার্ষিক রাজস্ব আয়ের ৩.৩%এর সমপরিমাণ, (৪) দেশের বার্ষিক রপ্তানী আয়ের ৩.৭% এর সমপরিমাণ, (৫) সরকারের মোট বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৬% এর সমপরিমাণ, (৬) সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অভ্যন্তরীণ সম্পদের ১২% এর সমপরিমাণ।

সেই সাথে বিকাশ-বিস্তৃতির সম্ভাবনা নির্দেশে আরো গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে যেহেতু মৌলবাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে ৭.৫% থেকে ৯%) মূল ধারার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার (বার্ষিক গড়ে ৪.৫%

থেকে ৫%)-এর তুলনায় অধিক সেহেতু অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে– অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের খুব একটা অবকাশ নেই। অর্থাৎ প্রবণতাটা এমন যে মূলধারার অর্থনীতির মধ্যে মৌলবাদের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে বেশি জায়গা দখল করতে পারে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের অংশ আর সরকারের মধ্যে তাদের অংশ বৃদ্ধিতে মৌলবাদী অর্থনীতি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।

মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীত্ব যে রাষ্ট্রকেই জোরদখল করতে চায় এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় এ জন্য যে: (১) তারা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সম্ভাব্য উচ্চ মুনাফা অর্জনের খাতসমূহে বিনিয়োগ করছে, অর্থাৎ পারলৌকিক জীবন নিয়ে লৌকিকতায় তারা যতই পারদর্শিতা প্রদর্শন করুন না কেন ইহলৌকিক-পার্থিব জীবন সম্পর্কে তারা অনেকের চেয়ে অধিকতর সজাগ-সচেতন; (২) তারা স্ট্রাটেজিক বিনিয়োগে অধিক উৎসাহি; (৩) বিনিয়োগের খাত নির্ধারণে তারা দ্রুত জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রগুলিকেই বেছে নিয়েছে; (৪) তাদের খাত-প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিনিয়োগ কাঠামো যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ; (৫) তাদের বার্ষিক নীট মুনাফার মাত্র ১০ শতাংশ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ করে ৫ লাখ দলীয় সদস্য পূর্ণকালীন নিয়ুক্তি দেয়া সম্ভব– তারা সেটা করে এবং অন্যান্য খাতে ক্রস-ভর্তুকি দেয়; (৬) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রাটেজিক অবস্থানে উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ক্যাডারদের পরিকল্পিতভাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য তারা তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহার করে; এবং (৭) সশস্ত্র জঙ্গীরা এতই সংগঠিত ও শক্তিমান যে জঙ্গীরা ধরা পড়লে তাদের আনুষ্ঠানিক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল এবং ক্ষমতার ভিতরে কোনো কোনো শক্তি তাদের ছেড়ে দেবার জন্য প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রক্ষমতা অপপ্রয়োগ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য শক্তি প্রয়োগ করে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়; চিহ্নিত জঙ্গীদের ধরে ছেড়ে দিতে হয়; আর তাদের নিয়ন্ত্রক গড-ফাদাররা সম্পূর্ণ ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র জঙ্গীবাদী রাজনীতির বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীনতার বিজয় নিয়ে আমরা যথেষ্ট মাত্রায় আত্মতুষ্ট ছিলাম। সঙ্গত কারণও ছিল। জাতি হিসেবে আমরা এইই প্রথম দেখলাম যে গণতন্ত্র, জাতিয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা– এ চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মূল স্রোতের ধর্মীয় চেতনা যদি উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী হয়ে থাকে এবং তা বংশপরম্পরা মানস-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের ঐ চার মূলনীতিও আমাদের সুপ্ত আকাঙ্খার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। আমাদের আত্মতুষ্টির কারণ এও হতে পারে যে সম্ভবত: তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে আমরাই প্রথম, যারা সেক্যুলারইজমকে ১৯৭২-এর সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম– অবশ্য পরে তা বাতিল হতে হতে 'ইসলাম হইবে রাষ্ট্রধর্ম'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের সুপ্ত ইচ্ছা-আকাঙ্খার কাগুজে প্রকাশ-এ আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি (যাদের ক্ষমা করে আমরা ইসলাম ধর্মের মূল স্রোতের বাহক পরিগণিত হতে পারি) পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলো যে রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে মানুষের জীবনে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটবে না; তারা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করতে পেরেছিলো যে এ মানুষই কয়েকবছরের মধ্যে চলমান নেতৃত্বের প্রতি মোহহীন হবে, আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তারা মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারবে। সমসাময়িককালে প্রগতির গতি এগুলো ঢিমে তালে আর তারা লক্ষ্যার্জনে জোরকদমে অথচ বেশ গোপনে এগুবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো । যে প্রস্তুতির ফলশ্রুতিই হলো গ্রাম দখল; কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচিতি গোপন রেখে এগুনো; ধর্ম প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র অবস্থান; রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান দখল; আর বেসরকারি সংস্থার নামে ব্যাপকভাবে গ্রাম ও শহরের স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র মানুষের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ ও তা সুদৃঢ়করণ। এ কৌশল কার্যকর করতে মৌলবাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমূহ যেমন নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানও শক্তিশালী হয়েছে। এ নিরিখে ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতৃত্ব যত না ভাববাদী তার চেয়ে

অনেক গুণ বেশি বাস্তববাদী—বস্তুবাদী। গত অর্ধ শতাব্দীর এ প্রক্রিয়ায় এখন তাদের অর্জনটা এমন যে একদিকে প্রতিটি জাতীয় সংসদ আসনে তারা গড়ে ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ ভোট সংগ্রহে সক্ষম আর অন্যদিকে নির্বাচনে কোটি টাকার কালো টাকা ও প্রয়োজনীয় পেশী শক্তি সরবরাহের ক্ষমতাও তাদের এখন আছে। এ কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়।

উগ্র জঙ্গীবাদ এখন যে "আত্মঘাতি বোমা সংস্কৃতি" চালু করেছে তার ফলে জাতী-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের জীবণই এখন বিপন্ন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গীবাদ-উদ্ভুত বিপন্নতার কিছু নূতন মাত্রা লক্ষণীয়: (১) এ জঙ্গীত্ব দেশের উৎপাদনশীল খাতসমূহের "সরবরাহ চেইন" ভেঙ্গে ফেলে উৎপাদন-বণ্টন-পরিভোগ-এর স্বাভাবিক সিষ্টেমকেই ভেঙ্গে ফেলার সুদূর প্রসারী-অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। (২) এ জঙ্গীত্ব এখন দেশের গ্রামাঞ্চল, ক্ষুদ্র শহর ও শহরতলীতে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করছে- যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ইঞ্জিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কর্মকাণ্ড বিনষ্টের মাধ্যমে পুরো অর্থনীতিকে নীচে থেকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়। (৩) এ জঙ্গীত্ব তাদের কর্মকাণ্ড দিয়ে এমন এক ত্রাস সৃষ্ঠি করেছে যখন গ্রামের হাটবাজার সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ গ্রামের বাজারে সন্ধ্যার পরে সার, ডিজেল, বীজসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে আশংকা করা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুতদারী বাড়ছে/বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রূদ্ধ হচ্ছে/হবে। লক্ষ্যণীয় যে অর্থনীতিতে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রবৃদ্ধি সহায়ক মৌসুমে এসবের তীব্রতা বাড়ছে। ফলে এ আশংকা আছে যে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কালোবাজারী-মজুতদারী বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে জনজীবন অধিকতর দুর্বিষহ হবে, আর অন্যদিকে এ অবস্থাকেই আবার জঙ্গীরা তাদের জঙ্গীত্ব আরো বাড়ানোর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে। (৪) এ জঙ্গীত্ব সমগ্র দেশে ভয়-ভীতি প্রদশর্ন থেকে শুরু করে যে হারে আত্মঘাতি বোমা ব্যবহার করছে তার ফলে দেশজ বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হচ্ছে। আর দেশজ বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হলে বিদেশি বিনিয়োগ অধিকতর অনুৎসাহিত হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগহীন এক অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন ভেঙ্গে পড়বে সমগ্র অর্থনীতি-ব্যবস্থা। আর এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অসম্ভব নয়।

সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় এ জন্যেও যে তারা ইসলামের মুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া" (economic power-based political process)-কে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র (খোমেনি পদ্ধতি)। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" (political ideology) রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। এ পদ্ধতিতে

- একদিকে বলা হবে ইসলামে নারী নেতৃত্ব অস্বীকৃত, আর অন্যদিকে সরকারে জায়গা পেলে নারী নেতৃত্বে অসুবিধে নেই;
- একদিকে বলা হবে ইসলামে সুদ হারাম, আর অন্য দিকে তাদের কর্তৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানে ভিন্ননামে চুটিয়ে সুদ খেলে অসুবিধে নেই;
- একদিকে যেমন পবিত্র কোরান-হাদিছ যথেচ্ছ ব্যবহার করা হবে, আর অন্যদিকে টাকা-পয়সা দিয়ে প্রলুব্ধ করে মানুষকে তাদের জনসভায় আনা হবে;
- একদিকে বলা হবে ইসলামে মানুষ হত্যা-আত্মহত্যা মহাপাপ, আর অন্যদিকে বলা হবে ইসলামী হুকুমত কায়েমের জন্য নিরীহ মানুষ হত্যাই জেহাদ;

- একদিকে বলা হবে ইসলামে মদ্য পান হারাম, আর অন্যদিকে তারা সরকারের অংশীদার হলে মদের শুল্ক কমলে তাদের অসুবিধে নেই;
- একদিকে বলা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলাম বিরোধী, আর অন্যদিকে সরকারের অংশীদার হবার সময়ে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসন জায়েজ;
- একদিকে বলা হবে ভারত শত্রু রাষ্ট্র, আর অন্যদিকে সরকারের মন্ত্রী থাকাকালে ভারতের সাথে অন্যায্য চুক্তি স্বাক্ষরে অসুবিধে নেই।

সবকিছু মিলে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এক কথায় এরকম: স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী জঙ্গী শক্তি জানে তারা কি চায়, বিপরীতে আমরা জানি না আমরা কি চাই; ওরা জানে ধর্মের 'mythos' আর বাস্তব জীবনের 'logos'-এর সমন্বয়ে কেমন করে তা অর্জন করবে, বিপরীতে আমরা জানি না; ওরা তাদের লক্ষ্যার্জনে সুসংগঠিত, আমরা অসংগঠিত; লক্ষ্যার্জনে ওদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, বিপরীতে আমাদের দ্বিধা আছে; ওরা ধর্মের দোহাই দিয়ে খুন-খারাবিসহ যা কিছু করছে তা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, আর আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে হয়; ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, দারিদ্র, বঞ্চনা, এবং যুব সমাজের বেকারত্ব হতাশাকে ওরা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে সিদ্ধহস্ত, আর আমরা "দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার-হতাশা"-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম এড়িয়ে চলেছি। আমাদের অস্বচ্ছতা, অনৈক্য ও নিষ্ক্রিয়তা ওদের ভিত শক্তিতে সহায়ক হচ্ছে।

ধর্মান্ধ জঙ্গীত্ব রোধে সেক্যুলার ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই

ইসলাম ধর্মসহ বিভিন্ন ধর্ম প্রচারে ঐতিহাসিকভাবে কোথাও যুদ্ধবিগ্রহ, কোথাও শান্তিপূর্ণ পথ আবার কোথাও এ দু'য়ের মিশ্রিত পথের ভূমিকা জানা আছে। লক্ষণীয় যে যেখানেই যুদ্ধ-তরবারিকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই হয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নয়ত বা যুদ্ধংদেহী রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি জেঁকে বসেছে। কিন্তু যেখানেই অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পথে দীর্ঘকাল ধর্ম প্রচার এগিয়েছে– যেমন আমাদের দেশে ওলি- আওলিয়া-সুফি-সাধকরা– সেখানে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কখনও শক্ত ভিত পায়নি। উল্টো যখনই ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারে চেষ্টা হয়েছে তখনই তা বাধার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ এ দেশে শান্তিপূর্ণ পথে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম পালনের ফলে মানুষ বংশপরম্পরা ধর্মভীরু হয়েছেন কিন্তু বক-ধার্মিক, ধর্মান্ধ হন'নি। অর্থাৎ ধর্মের মূল ধারণাটি এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে বহুলাংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাহন হয়েছে। আর সে কারণেই মৌলবাদের অর্থনীতি এ দেশে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ঐ অর্থনীতির শক্তি ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল সম্ভব হবে না।

এক্ষেত্রে কয়েকটি উদাহরণ বেশ প্রাসঙ্গিক হতে পারে: (১) এ দেশে শত্রু ও অর্পিত সম্পত্তি আইনে ৫০ লাখ হিন্দু ধর্মাবলম্বি মানুষের যে ২১ লাখ একর ভূ-সম্পত্তিসহ অন্যান্য সম্পদ গ্রাস করা হয়েছে তা গ্রাস করেছেন মাত্র ০.৪% মুসলমান (গ্রাসকারীরা সবাই যদি মুসলমান হন) – অর্থাৎ ৯৯.৬% মুসলমান ভিন্ন ধর্মের মানুষের সম্পদ জোরদখলের সাথে সম্পৃক্ত নন – (অনেকেই এটা হিন্দু-বনাম মুসলমান সমীকরণে রূপান্তরের অপপ্রয়াস চালান); (২) বাগমারায় উগ্র-জঙ্গী মৌলবাদ– বাংলাভাইকে– রাষ্ট্রযন্ত্র যতই মদত দিক না কেন– এলাকার মানুষই কিন্তু জোটবদ্ধভাবে মোকাবেলা করছে– মূল ধর্ম-গোষ্ঠির অসাম্প্রদায়িক সুপ্ত চেতনার এ-এক স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ; (৩) ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদ ভেঙ্গে পড়ার পরে ঢাকা মেডিকেলসহ অন্যান্য হাসপাতালে হিন্দু ধর্মাবলম্বি আহত ছাত্রদের জীবন বাঁচাতে রক্ত দানে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সবাই যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন– তা নিশ্চয়ই অসাম্প্রদায়িক চেতনার অপার শক্তিকেই নির্দেশ করে; (৪) ইসলাম ধর্মের পজিটিভ ডিএনএ-র বাহক এ দেশের একজন সাধারণ মুসলমানও কি

সুইসাইড বোমাবাজদের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেন? না কি প্রায় সকলেই মনে করেন যে এসবই ধর্মের নামে গভীর ষড়যন্ত্রমূলক অধর্মের কাজ?

এত কিছুর পরেও, "আত্মতুষ্ট হয়ে বসে থাকলে বিপদ নেই"– এমনটি ভাববার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। কারণ বিষয়টি গভীরভাবে রাজনৈতিক– ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য প্রাগ্রসর পরিবেশ সৃষ্টির। অতএব লড়াইটিও রাজনৈতিক। মৌলবাদী জঙ্গীত্বের ভিত যে পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে ও করছে তাতে লড়াইটা হতে হবে সর্বব্যাপী বহুমাত্রিক ও বহুকেন্দ্রিক। এ লড়াই অনগ্রসর মানস-কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রগতির লড়াই। এ লড়াই সুফি-সাধক-ওলামাদের জন্য মানবতাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারা পুনঃস্থাপনের লড়াই। সুতরাং এ লড়াইয়ে একদিকে ইসলাম ধর্মের উগ্র সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ধারার মোকাবেলায় মানবকল্যাণকামী সুফি-উলামা ধারার প্রবক্তাদের– যারা ঐতিহাসিকভাবেই মূল ধারার প্রবক্তা– মানবকল্যাণে সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আর অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক চেতনার লালন এবং মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীনতার ভিত্তি প্রসার নিমিত্ত জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই হতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক জঙ্গীত্বের ভিত্তিমূল দুর্বল করার একমাত্র পথ।

মৌলবাদী সশস্ত্র জঙ্গীত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত: নিশ্চিত যে "এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"– এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে, আর তা হতে পারে উচ্ছ্বাস-উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প মেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক জঙ্গীত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যে ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা কয়েকদিনে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। বাস্তবে যা সম্ভব তা হল "ক্ষতি হ্রাসের" (damage minimize) কৌশল দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল" হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা: (১) জঙ্গীদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা; (২) জঙ্গীদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎসমূখ বন্ধ করা; সংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা; (৩) জঙ্গী কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে ধরা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য সবদিক থেকে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করা; (৪) সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গীত্ব-প্রমোটার তাদেরকে সরকার থেকে বহিষ্কার করার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা; (৫) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা; (৬) ব্যাপক জনগণের মধ্যে জঙ্গীদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে সিরিয়াস প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই এ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ইত্যাদি। আর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে একটি– তা হলো দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য বিলোপসহ সেক্যুলার মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে সেক্যুলার ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই।

মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গীবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি উভয়ই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকল সেক্যুলার শক্তির সুদৃঢ় ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির দারিদ্র দূর না করে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য বিলুপ্ত না করে ধর্মীয় জঙ্গীত্ব চিরস্থায়ীভাবে রোধ করা যাবে না। এ জন্য এ মুহূর্তেই প্রয়োজন দেশপ্রেমিক সাহসী নেতৃত্ব ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। আমাদের প্রত্যাশা, একটি বৈষম্যহীন সেক্যুলার বাংলাদেশ।